একবার বলো, উত্তম গল্প

পার্থ দে

বইবন্ধু

উত্তম কথা

বইটির নাম "একবার বলো, উত্তম গল্প" কেন রাখলাম? স্বাভাবিক প্রশ্ন, অনেকেই করবেন। আপনিও করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী? এরকম নাম রাখলে জবাবদিহি তো করতে হবেই! এই নাম কি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য? বিজ্ঞাপনী ভাষায় যাকে বলে "Noisy way to draw attention", নাকি অন্য কারণও আছে?

এমন নাম শুনে বাঙালির নস্টালজিয়া "বসন্ত বিলাপ" ছায়াছবির দৃশ্য হয়তো চোখের সামনে ভেসে উঠবে। অভিনেতা চিন্ময় রায় তাঁর সিনেমার প্রেমিকা অভিনেত্রী শিবানী বসুকে বলছেন, "একবার বলো, উত্তমকুমার!"

সেই দৃশ্যের বিন্যাস ও সংলাপটি শুনে দর্শক হেসে গড়িয়ে পড়েছে। কারণ উত্তমকুমার হলেন সত্যিই সর্বোত্তম, বাঙালির রুপোলি পর্দার আল্টিমেট ফ্যান্টাসি, কিংবদন্তির পরম মান। তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রতিটি বাঙালি পুরুষই রূপে, ব্যক্তিত্বে তাঁর মতো হতে চায়। সেখানে অভিনেতা চিন্ময় রায়ের মতো রোগা, গ্ল্যামারহীন গড়পড়তা বাঙালি যুবক যখন সেই সংলাপ বলছে— তখন দৃশ্যটা সাধারণ হিউমারকে ছাপিয়ে গিয়ে একটা ডার্ক কমেডি হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে, আমার এই বইয়ের হতশ্রী গল্পগুলোর ইচ্ছেও তো উত্তমকুমার হয়ে ওঠার! তারাও চায়, পাঠক তাদের পড়ে বলুক, "আহা, উত্তম গল্প!"

এমন চাওয়া কি দোষের, বলুন? আমি লেখক হিসেবে শুধুমাত্র আমার গল্পগুলোর আবদার রাখার চেষ্টা করেছি।

লেখক হিসেবে বইয়ের নামকরণের পিছনে অন্য দুটি কারণও আছে। প্রথমত, এই বইয়ের আটটি গল্পের প্রায় সবগুলোই প্রকৃতিগতভাবে ডার্ক কমেডি, হিউমার, সিরিও-কমিক এবং স্যাটায়ারধর্মী। দ্বিতীয়ত, আটটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্পই

লেখা হয়েছে উত্তম পুরুষে।

তাই সেদিক থেকে বিচার করলেও বইয়ের নামকরণ অনেকটাই লাগসই।

পরিশেষে আসল সত্যটা বলি। এতক্ষণ যা-যা বললাম, সবই অপযুক্তি। আসলে ছোটোবেলা থেকে আমার নায়ক হওয়ার খুব শখ ছিল। বারকয়েক বাড়ি থেকে পালিয়ে বম্বে গিয়ে নায়ক হওয়ার কথাও ভেবেছি, কিন্তু ধরা পড়ে বাবার হাতে 'উত্তমমধ্যম' খাওয়ার ভয়ে পিছিয়ে এসেছি। ঠাঙানি খেয়ে কে আর 'উত্তম' হতে চায়, বলুন! বড় হওয়ার পর যখন আমার ওপর কোনো এক তরুণীর কৃপাদৃষ্টি পড়ল, তখনও এক নির্জন দুপুরে তাকে আকুতি জানিয়ে বলেছিলাম— "একবার বলো, উত্তমকুমার।"

খিলখিলিয়ে উঠে সে বলেছিল, "ভ্যাট, তুমি কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে উত্তমকুমার হে? ইশ্, কোথায় হরিদ্বার আর কোথায়..."

খুব দুঃখ হয়েছিল সেদিন। সেই কন্যেটিকেই ফুলশয্যার রাতে আর-একবার চান্স নিয়ে সংলাপটা বলেছিলাম। কন্যেটি বলেছিল, "আজ থাক বরং। চলো, আজ আমরা একটু শাহরুখ খান আর কাজল খেলি।"

বিয়ের অনেক বছর পর আজ আমরা তুলসী চক্রবর্তী আর মলিনা দেবী খেলি। কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, আশায় বাঁচে চাষা! কয়েকদিন আগে দুজনে বসে সান্ধ্য চা পান করছিলাম। আকাশে চাঁদ উঠেছিল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। আমি নাছোড়বান্দার মতো বললাম, "একবার বলো, উত্তমকুমার।"

সে বলল, "তুমি উত্তমকুমার নও। তুমি উত্তম গুলবাজ। বিয়ের আগে আমাকে হাজার হাজার গুল দিয়ে পটিয়েছিলে। আমি সব সত্যি ভেবে ফেঁসেছিলাম!"

ব্যাস। আমার আশার বেলুনটা চুপসে গেল। উত্তমকুমার হওয়ার সাধ মিটে গেল জন্মের মতো। তাই এখন শুধু পাঠকদের দোরে দোরে মিনতি নিয়ে ঘুরি, "একবার বলো, উত্তম গল্প!"

ইতি

বিনত লেখক

সূচিপত্র

পাকা চাকরি ❖ ১১

রানির কভার ❖ ৩৫

ইলেকশন ডিউটি ❖ ৬৯

সাতনরি হার ❖ ৯৯

মোনালিসা হাসছে ❖ ১১৭

ধম্মের কল ❖ ১৩৯

ছৌ ❖ ১৫৩

এক্স ফ্যাক্টর ❖ ১৬৯

পাকা চাকরি

সরকারি অফিসবাড়ির মধ্যে ঢুকলে একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসে। আধো অন্ধকার করিডর। ওপরে ওঠার সিঁড়ির দেয়ালে পানের পিকের দাগ। বার্ডকেজ লিফ্‌টে প্রাগৈতিহাসিক লিফ্‌টম্যান। দপ্তরগুলোয় ঢুকলে চোখে পড়ে টেবিলের সারি। তার ওপর ডাঁই করে রাখা ধুলো-পড়া নোংরা ফাইল। কড়িবরগা-দেওয়া উঁচু সিলিং থেকে লম্বা ডান্ডাওয়ালা পাখা নীচের দিকে ঝুঁকে পুরোনো দিনের লং প্লেয়িং রেকর্ডের মতো শব্দ করে ঘুরে চলেছে। বেলা দেড়টার সময় যারা চেয়ারে বসে আছে, তাদের মধ্যে চারজন খবরের কাগজ পড়ছে, তিনজন খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, বাকি দুজন টিফিন বাক্‌সো খুলে আয়েশ করে টিফিন খেতে খেতে ভাবছে, আড়াইটে থেকে কাজ শুরু করবে।

এরকম একটা অফিসে আমার চাকরি হবে! অবশ্য সেটা ভেবে আমার লজ্জা হচ্ছে এমনটা মোটেই নয়। বরং কিছুটা আনন্দই হচ্ছে। সোনার আংটি যেমন বাঁকা হলেও কিচ্ছু যায় আসে না, তেমনই সরকারি চাকরির রূপ-জৌলুস না থাকলেও চলে। মাস গেলে ভালো মাইনে আছে— বেসিক পে, ডিএ, হাউস রেন্ট, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স— সব গুনেগেঁথে পকেটে ভরে নিলেই হল। চাকরিটা অবশ্য জুটছে আমার বাপের দৌলতে। পিতৃদেব মরে গিয়েও আমার জন্য খাজানার দরজা খুলে দিয়ে গেছেন— ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরি!

আমার পিতৃদেব পঃ বঃ রাঃ সঃ চাকুরে ছিলেন। খাদ্য দপ্তরে চাকরি করতেন। খাদ্যের গণবণ্টনব্যবস্থা নিয়ে ইদানীং সরকার বা সাধারণ মানুষ কেউই তেমন মাথা ঘামায় না। ওই দপ্তরের এগারোটা ডাইরেক্টরেট বন্ধ হতে হতে তিনটেতে এসে ঠেকেছে। উনি তার মধ্যেই নিজের চাকরিটা ধুকধুক করে টিকিয়ে রেখেছিলেন। ওঁর চাকরির দৌলতে আমাদের সংসারও টিকে ছিল। তবে আট বছর আগে ক্যানসারে মা চলে যাওয়ার পর বাবা একটু এলোমেলো, একটু ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিলেন। আমার তখন ক্লাস ইলেভেন। বাবা কখন বাড়ি আসে, কখন যায়, কিছুই টের পাই না। আমিও ছাড়া গোরুর মতো পাড়া চরে বেড়াই।

রাতে বাড়ি ফিরি কি ফিরি না। দুজনের দূরত্ব বাড়তে লাগল, একই বাড়িতে দুজন অপরিচিতের মতো থাকি, কোনো কথা হয় না। অগোছালো ঘরদোর, থমথমে পরিবেশ। পাড়ার লোকে বলত ভূতের বাড়ি। এক পিসি এসে মাঝেমধ্যে ভূতের বাড়ির হাল ফেরানোর চেষ্টা করত, কিন্তু তার নিজের সংসার ফেলে এসে কতদিন আর দাদার সংসারে ঝি-গিরি করবে। একদিন পিসিও আমাদের ভূতের বাড়িকে টা টা করে চলে গেল।

মায়ের ইহলোক ত্যাগের পরপরই আমার পড়াশোনাও মায়ের ভোগে চলে গেল। মিলন হলে নুন শো-এর 'এ' মার্কা ছবি দিয়ে শুরু হল। টিকিটের পয়সা লাগত না, লাইটম্যান ভানুদা ম্যানেজ করে হলে ঢুকিয়ে দিত। তারপর হেলাবটতলায় দিলীপদার গ্যারাজের পিছনের ঠেকে গাঁজার ধোঁয়ায় জীবনের দুঃখ উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার দুঃখবিলাস টেকনিক শিখলাম। এলাকার যত লাথখোর বন্ধু জুটে গেল— তপনা, নাককাটা অসীম, পেটো পমপম, মুরগি নিতাই! দিলীপদা বুঝিয়ে দিল, মনের ক্ষত জুড়োনোর আসল অ্যান্টিসেপটিক হল মদ। বুঝে গেলাম, ইস্কুল-কলেজের বিদ্যের চেয়ে ঢের বিদ্যে দিলীপদার পেটে আছে।

তবে দিলীপদার আসল এলেম বুঝতে পারলাম আমার বাবার প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর। গাঁজার ধোঁয়া আর বোতলের বুদ্‌বুদের ভিতর দিয়ে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিল— "বান্টি, তুই গোষ্ঠদার একমাত্র ছেলে। গোষ্ঠদার সরকারি চাকরি, কিন্তু শরীরের যা হাল, কিছু একটা হয়ে গেলে... অফিস থেকে তোর চাকরির একটা ব্যবস্থা ঠিক..."

ব্যাস। কথাটা সেদিন দিলীপদাকে শেষ করতে হয়নি। আমার অ্যান্টেনা ক্যাচ করে নিয়েছিল। সেদিন থেকে 'ডাই-ইন-হার্নেস' শব্দটা মাথায় খোদাই হয়ে গিয়েছিল। বাংলাটা অবশ্য খুব বিচ্ছিরি— মৃত সরকারি কর্মীর পোষ্যের চাকরি! এই পোষ্যের তালিকায় স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই পড়ে। কিন্তু দুনিয়াদারির মাস্টার ডিগ্রিধারী দিলীপদা আমার মাথায় সারকথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি, মানে রাহুল দত্ত, সান অব গোষ্ঠবিহারী দত্ত, বাপের একমাত্র ছেলে, এই দত্ত খানদানের এক লওতা জিতা জাগতা ওয়ারিশ! তাই পিতৃদেবের কিছু হলে তার চাকরি-বিষয়-আশয় সব আমিই পাব।

আমি বিকম পাস। এমন আইকম বাইকম ডিগ্রি নিয়ে বাংলা বাজারে নিজের দমে যে চাকরি জুটবে না তা-ও বহুদিন আগে বুঝে গিয়েছিলাম। তবু নিজের

বাবাকে তো আর গলা টিপে খুন করে চাকরি বাগানো যায় না, তাই অপেক্ষা করতে হল। মা মারা যাওয়ার আট বছর পর তৃতীয়বার হার্ট অ্যাটাকে বাবা চলে গেলেন। বাবার মৃত্যুর তিন হপ্তা পর তাঁর পারলৌকিক কাজকর্ম সেরে-টেরে এসেছি সেই ডাই-ইন-হার্নেস গ্রাউন্ডে চাকরির দরখাস্ত জমা দিতে।

ঘুম-ঘুম অফিসবাড়িটার সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পেরিয়ে শেষমেশ যে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তার পিছনে বসা বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক জামার বোতাম খুলে বগল চুলকোচ্ছেন। এমন নিবিষ্টচিত্তে কাজটা করছেন যে, সামনে দাঁড়ানো পঁচিশ বছরের একটা ছেলের অস্তিত্ব তিনি টেরই পাচ্ছেন না। এই সময় কাশি কাজে দেয়। দুবার খুকখুক করে কাশলাম।

ভদ্রলোক শিবনেত্র তুলে চাইলেন, "বলবেন কিছু?"

"আমি গোষ্ঠবিহারী দত্তর ছেলে, বান্টি... ভালোনাম রাহুল দত্ত।"

"অ।"

"আপনি বড়োবাবু জয়কৃষ্ণ তালুকদার, মানে জয়কৃষ্ণকাকু তো? বাবা আপনার কথা খুব বলতেন।"

"অ। বসুন।"

"কাকু, আমি দরখাস্তটা তৈরি করেই এনেছি।"

"কীসের দরখাস্ত?"

"বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটার।"

হঠাৎ বগল চুলকানো থামিয়ে জয়কৃষ্ণ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। পাক্কা এক মিনিট চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চাকরিটা কে করবেন? আপনি না আপনার বোন?"

কথাটার মানে বুঝলাম না। আমার গঞ্জিকাসেবিত মস্তিষ্কে অনেক কিছুই সেঁধোয় না। বোন শব্দটা বোন চায়নার বাসনের মতো আমার চেতনায় সশব্দে আছড়ে পড়ল! বললাম, "মানে?"

"মানে তো আপনি বলবেন!"

"কিন্তু জয়কৃষ্ণকাকু, আমার তো কোনো বোন-টোন নেই!"

"দাঁড়ান দাঁড়ান।" বলে টেবিলে রাখা ফাইলের ডাঁই থেকে একটা ফাইল বের করে আনলেন ভদ্রলোক। ফাইল খুলে অনেক কাগজ হাতড়ে একটা আবেদনপত্র বের করে আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে বান্টিবাবু, আপনার

ভালোনাম কী যেন..."

"রাহুল দত্ত।"

"হ্যাঁ, রাহুল, এটা দেখুন, কালই জমা দিয়ে গেছে।"

আমি আবেদনপত্রটা ঘুরিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম—

নাম— প্রতিভা দত্ত

পিতা— গোষ্ঠবিহারী দত্ত

ঠিকানা— ৬/১ডি গঙ্গাধর বিদ্যানিধি বাই লেন, হাওড়া।

বয়স— ২৪ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা— বিকম (পাস)

আবেদনপত্রের ডানদিকের ওপরে একটা মেয়ের পাসপোর্ট-সাইজের ছবি। মেয়েটার গায়ের রং ঈষৎ চাপা, কিন্তু নাক-চোখ বেশ ধারালো। ঠোঁটের ওপরে বাঁদিকে একটা তিল আছে, যেটা দেখেই মনে হচ্ছে বেশ ধড়িবাজ মেয়ে।

নাম আবার প্রতিভা দত্ত! এ মেয়ের প্রতিভার ঝলক দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। বললাম, "স্যার, এ আমার বোন-টোন নয়, আমার কোনো বোন নেই, কস্মিনকালে ছিলও না। এ মেয়েটা নির্ঘাত জালিয়াত!"

"সে আমি কী করে জানব, বলুন? আপনার বাবার বকেয়া প্রফিডেন্ট ফান্ড, ডেথ গ্র্যাচুইটি বাবদ এককালীন টাকা যেটা প্রাপ্য হয় তা সার্ভিস রুল অনুযায়ী মৃত কর্মচারীর পোষ্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে।"

"মানে?" আঁতকে উঠলাম।

"হ্যাঁ, আইন মোতাবেক সেটাই হয়। তবে চাকরি তো যে-কোনো একজনের হবে, দুজনের নয়। হয় আপনি, নয় আপনার বোন।"

"উঃ স্যার, মাইরি বলছি, এ আমার বোন নয়। আমার কোনো বোন নেই।"

ইতিমধ্যে যে চারজন খবরের কাগজ পড়ছিল, তিনজন খড়কে কাঠি নিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল আর দুজন কাজ শুরু করার উদ্যোগ করছিল, তারা আসন ছেড়ে আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একজন বলল, "আপনি গোষ্ঠবাবুর ছেলে! তাহলে উনি কে, কাল যিনি এসেছিলেন?"

দ্বিতীয়জন বলল, "গোষ্ঠবাবুর চরিত্র তো ভালো বলেই জানতাম। লেখালিখি করতেন। অবশ্য লেখকদের চরিত্র নিয়ে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।"

তৃতীয়জন বলল, "মেয়েটার মুখে কিন্তু গোষ্ঠবাবুর মুখটা একেবারে বসানো!"

মেয়েটার ছবিটার ওপর ফের ঝুঁকে পড়লাম। আমার বাবার মুখের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে বটে! মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই পারছি না, এত বছর ধরে বাবা মা-কে ঠকিয়ে দুই নৌকোয় পা দিয়ে দিব্যি কাটিয়ে গেছে! অথচ মা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, বাবার জীবনে অন্য নারী আছে! আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নার্ভাস গলায় বললাম, "জয়কৃষ্ণকাকু, মেয়েটা আবার কবে আসবে?"

"কবে আসবে তা তো বলা মুশকিল। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটগুলো সামনের সপ্তাহে জমা দিতে আসবে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আগামী মঙ্গলবার আসতে পারে কি না। আমি বললাম, আসুন। দেখুন, হয়তো মঙ্গলবার আসতে পারে।"

"আমি মঙ্গলবার আসব" বলে আমার আবেদনপত্রটা বড়োবাবুর টেবিলে রেখে চলে এলাম।

।। ২ ।।

আমি ঝড়ের গন্ধ পাই। আমি না চাইলেও ঝড় আমাকে ঠিক খুঁজে নেয়। এই পঁচিশ বছরের জীবনে যখন-তখন এসে আছড়ে পড়েছে ঝড়। মা যাওয়ার বছরে শুরু হয়েছে তার তাণ্ডব, তারপর গত আট বছরে সব তছনছ করে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে যাওয়ার পর যখন ভাবলাম, এবার সব গুছিয়ে নেব, তখনই আবার হাজির হয়েছে সে।

বাবার অফিসের লোকজন যখন তির্যক কথা বলল, তখনও এতটা গায়ে লাগেনি, কিন্তু দিলীপদা যখন বিকেলে মদের ঠেকে বসে বলল, "বান্টি, তোর বাবা তো দেখছি, গুরুদেব লোক ছিলেন!" তখন মাথাটা পুরো ঘেঁটে গেল।

দিলীপদাই আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ওর বুদ্ধিতেই ঠিক করলাম, মেয়েটার সামনাসামনি হয়ে একটা হেস্তনেস্ত করব, কিন্তু দেখা হওয়ার কথা তো পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার। তার মানে এক সপ্তাহ পর! কিন্তু ব্যাপারটা এতদিন ফেলে রাখা যাবে না। দিলীপদা বলে, ক্যাজড়া-ক্যাচাল ফেলে রাখলে ঠান্ডা মেরে যায়, মামলা গরম থাকতে সালটে নিতে হয়।

মোবাইলের গ্যালারি খুলে প্রতিভা দত্ত নামে ডাইনিটার আবেদনপত্রের ছবিটা

পেলাম। ভাগ্যিস ফোনে ছবিটা তুলে রেখেছিলাম! যোগাযোগের ফোন নম্বরটা ওখানেই লেখা আছে। ভাবলাম, ফোনটা করেই ফেলি। এখন সুলুক সুলুক নেশা রয়েছে, ফোনে যা ইচ্ছে বলে নেওয়া যাবে, পরে নেশা কাটলে হয়তো বলতে পারব না।

নম্বরটা টিপে ফোন করলাম। রিং হচ্ছে ওপাশে।

"হ্যালো।"

"হ্যালো।"

"কে বলছেন?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আরে আপনি কে বলছেন? আপনিই তো ফোনটা করলেন! আশ্চর্য মানুষ তো!"

"আমি বান্টি, মানে... ইয়ে রাহুল।" একটু থমকে বললাম।

"আমি অঞ্জলি, মানে... ইয়ে কাজল।"

"আপনি আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছেন!"

"ইয়ারকি করব কেন! অঞ্জলি আমার নাম, কাজলও আমার নাম।"

"আপনি প্রতিভা দত্ত নন?"

"হ্যাঁ, প্রতিভা দত্তও আমার নাম। আসলে এক-একজন আমাকে এক-এক নামে ডাকে। তবে আপনি আমাকে টিয়া বলে ডাকতে পারেন।"

"আপনাকে আমার কোনো নামেই ডাকার ইচ্ছে নেই, একটা দরকারি কথা বলার জন্য ফোন করেছিলাম।"

"জানি তো দরকারি কথাটা কী। ট্রু কলারে নামটা আগেই দেখেছি, রাহুল দত্ত। তার মানে সান অব গোষ্ঠবিহারী দত্ত, তা-ই তো?"

ভীষণ চমকে উঠলাম। এ তো মারাত্মক মেয়ে! মেয়ে না, মেয়েছেলে! দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "কী জানেন আপনি?"

"জানি যে আপনি আমার বাবার অযোগ্য সন্তান। বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটা আপনি নয়, আমিই করব।"

"আপনার বাবা মানে! আপনি... জালিয়াত, ফ্রড কোথাকার! অন্যের বাবাকে নিজের বাবা বলে চালাচ্ছেন..."

"মুখ সামলে!"

"কীসের মুখ সামলে? ফ্রড, চিট, তোকে আমি পুলিশে দেব।"

"আমি ফ্রড! তুই কী? গেঁজেল, মাতাল, অকম্মার ঢেঁকি। আমি প্রমাণ করে দেব গোষ্ঠবিহারী দত্ত আমার বাবা।"

"তুই রাখ ফোন, তোকে আমি দেখে নেব।"

"তুই কত বড়ো হনু, সেটা আমিও দেখব।"

"চোপ!"

"চোপ!"

"তবে রে..."

"তবে রে..."

ফোনটা কেটে দিলাম। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। পুরো ভেজা ফ্রাই করে ছাড়ল মেয়েটা। বলল, ও নাকি প্রমাণ করে দেবে ও গোষ্ঠবিহারী দত্তর মেয়ে!

এখুনি একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। অনিমেষকাকু বাবার বন্ধু, জেলা কোর্টের উকিল, ব্যারাকপুরের দিকে কোথায় যেন থাকেন। বাবার অসুস্থতার সময় মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসতেন। অবশ্য ইদানীং আমাকে এড়িয়ে চলতেন। ছোট্ট ঘটনা, এমন কিছু নয়। তার জন্য উকিল ভদ্রলোক বখেরা খাড়া করে দিলেন। আমার গাঁজার ঠেকের বন্ধু নাককাটা অসীম ক্ষুদিরাম কলোনি থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে দিঘা পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর মেয়েটা আবার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। ঘটনাটা নিয়ে সেদিন মালের ঠেকে খুব খিল্লি, আলোচনা হয়েছিল। আমি মাল-টাল টেনে বাড়ি ফিরে দেখি বাবার ঘরে অনিমেষকাকু বসে। ভদ্রলোককে কিছুটা রসিকতা করেই আচমকা প্রশ্ন করেছিলাম, "কাকু, বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করলে কি সিআরপিসি-র ধারা লাগু হয়? নাকি ওটা পিএনপিসি-তেই মিটে যায়?"

কথাটা শুনে প্রথমে উনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই প্রচণ্ড রেগে উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আমার কিস্‌সু যায় আসেনি। ভেবেছিলাম, উকিল অনিমেষ চৌধুরিকে আমার জীবনে কখনও দরকার পড়বে না, কিন্তু নিজের চাকরির প্রয়োজনে আজ এতদিন পর ফের দরকার পড়ল।

ফোন করলাম অনিমেষকাকুকে। "কাকু, আমি বান্টি, মানে রাহুল।"

ফোনের ওপাশে কাকুর বিরক্ত গলা, "চিনেছি। বলো।"

"ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরির একাধিক দাবিদার থাকলে সেক্ষেত্রে কী হবে, কাকু?"

"চাকরি তো একজনেরই হবে। বাকিদের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট লাগবে।"

"নো-অবজেকশন লাগবেই?"

"হ্যাঁ, ওটা লাগবেই।"

"ওটা ছাড়া হবে না?"

"না।"

"মানে, একেবারেই হবে না?"

শেষবার "না" বলে কাকু ফোনটা কাটলেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ফোন কাটার আগে উনি স্বগতোক্তি করলেন, "মামার বাড়ির আবদার নাকি!"

ওঁর শেষ কথাটা শুনে ঝট করে মনে হল, মামারা কি কোনোভাবে জানতে পারে, বাবার দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা একাধিক বিবাহ হয়েছিল কি না! আমার দুই মামা, তার মধ্যে বছরখানেক আগে বড়োমামা গত হয়েছেন, ছোটোমামা আবার আমার অভব্য আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে ইদানীং আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তবুও মরিয়া হয়ে তাকেই ফোন করলাম।

"মামা, আমি বান্টি বলছি।"

"এত রাত্তিরে ফোন করেছ, সব ঠিক আছে তো? অবশ্য এখন দিদি-জামাইবাবু নেই, তোমার ভালো থাকারই কথা।"

শ্লেষটা গায়ে মাখলাম না, বললাম, "মামা, আমার বাবা কি দুটো বিয়ে করেছিলেন?"

"কী যা-তা বলছ? আবার ওসব ছাইপাঁশ খেয়ে রাতদুপুরে মাতলামি করছ?"

"না মামা, সত্যি বলছি, ফুল সেন্সে আছি আমি। কিন্তু আমার জানা দরকার, বাবার কোনো প্রেমিকা ছিল কি না কিংবা কোনো অবৈধ প্রেম..."

"রাখো ফোন।" ওপাশ থেকে ছোটোমামা ধমকে উঠলেন, "তোমার বাবা একজন দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, আজীবন আমার দিদিকে প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছেন। তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ড ছিলেন না। শোনো, তুমি আর আমাকে একদম ফোন করবে না।"

ওপাশ থেকে ফোন কেটে গেল। আমি পড়লাম মহাবিপাকে। যাকে বলে